স্মরণিকা

প্রথম রাজ্য সম্মেলন

২১ জানুয়ারি, ২০২৪

স্থান ঃ মিত্র ইনস্টিটিউশন (মেইন), কলকাতা

শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চ

SIKSHANURAGI UNITED ASSOCIATION

স্মরণিকা

প্রথম রাজ্য সম্মেলন - ২০২৪

২১ জানুয়ারি, ২০২৪

মিত্র ইনস্টিটিউশন (মেইন), কলকাতা

শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চ

Sikshanuragi United Association

শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চ

প্রথম রাজ্য সম্মেলন - ২০২৪
২১ জানুয়ারি, ২০২৪
মিত্র ইনস্টিটিউশন (মেইন), কলকাতা

স্মরণিকা

প্রধান সম্পাদক
দূর্বাদল দত্ত

কার্যনির্বাহী সম্পাদক
অরূপ কুমার দে

সম্পাদক মণ্ডলী
সন্দীপ সাহু
সুমন কল্যাণ মৌলিক
অনামিকা চক্রবর্তী
অয়ন পাল
সুলগ্না পাল
তমাল মণ্ডল
সৌমেন্দ্র মোহন পাঁজা

প্রকাশক
কিংকর অধিকারী
সাধারণ সম্পাদক
শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চ

প্রচ্ছদ : সেখ ফারুক হোসেন

সম্পাদকীয়

শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চের প্রথম রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষ্যে স্মরণিকা প্রকাশের প্রাক্কালে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিকে অভিনন্দন জানাই। আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন, ২০১৮ সাল থেকে এই সংগঠনটি মূলত নির্বাচক, নির্বাচনকর্মীর নিরাপত্তার দাবি নিয়ে পথে নেমে আন্দোলন করে আসছে। একই সঙ্গে শিক্ষা বিভাগের নানা ত্রুটি ও অসংগতি শোধরাবার দাবি এবং পেশাগত সমস্যা সংক্রান্ত দাবি নিয়েও একই রকম সরব। এবং তা ভিতরে, বাইরে প্রথাগত রাজনৈতিক দলের, প্রকট কিংবা প্রচ্ছন্ন, কোনরকম সংস্রব ছাড়াই। অর্থাৎ এই সংগঠন সম্পর্কে খুব স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, এটি একটি অদলীয় সংগঠন যেখানে দল মত নির্বিশেষে শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন করতে পারেন।

সাধ ও সাধ্যের বিস্তর ফারাক থাকা সত্ত্বেও, কিছু মানুষের অদম্য উৎসাহ ও নিরন্তর শ্রমের উপর ভর করে এই স্মরণিকা সৃজিত হলো।

সীমিত পারগতার কারণে বেশি লেখনী প্রকাশ পায়নি। সার্বিকভাবে শ্রদ্ধেয় সদস্য মণ্ডলীর কাছে লেখনী আহ্বান করা সম্ভব হয়নি, এজন্য আমরা আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী। আগামী দিনে আপনাদের সহৃদয় সহযোগিতায় নিশ্চয় আজকের অপূর্ণ আশা ফুলে ফলে পূর্ণ হবে।

স্মরণিকা সৃজনের বিষয়ে যাঁরা উৎসাহের সঙ্গে শ্রমদান করেছেন, যাঁরা লেখা দিয়ে আমাদের সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁদের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমাদের সবার আন্তরিক চেষ্টায় শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চ যেন আজকের অদ্ভুত আঁধার ছিঁড়ে রক্তিম ভোরের স্বপ্ন দেখাতে পারে, এই প্রার্থনা করি।

স্মরণিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে সময়াভাব, অজ্ঞতা কিংবা অন্য কোনো কারণে যেকোনো রকম ত্রুটি থাকলে আগেই ক্ষমা চেয়ে রাখছি।

সর্বক্ষণ চলুক উত্তরণের পথে আমাদের সমবেত যাত্রা।

সূচিপত্র

হিসেবি বুদ্ধি-কবলিত রাজনীতি ও তার উদ্ধার চিন্তা
মীরাতুন নাহার ৫

শিক্ষার আজকাল পরশু-কিছু জিজ্ঞাসা
দূর্বাদল দত্ত ৮

সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতির আবর্তের বাইরে বেরিয়ে গড়ে তুলতে চাই ঐক্যবদ্ধ বৃহৎ প্ল্যাটফর্ম
কিংকর অধিকারী ১১

সরকারি বাংলা মাধ্যম স্কুল: বিপদ সংকেত স্পষ্ট
সুমন কল্যাণ মৌলিক ১৪

থাবা
রেহান কৌশিক ১৭

কবিতা ও কবিতা
সন্দীপ সাহু ১৮

উলঙ্গ রাজা, এখন
অরূপ কুমার দে ১৯

শুনি আহ্বান
সৌমেন্দ্র মোহন পাঁজা ২১

হিসেবি বুদ্ধি-কবলিত রাজনীতি ও তার উদ্ধার চিন্তা

মীরাতুন নাহার

সাম্প্রতিক সময়কালে রাজ্য-রাজনীতির বেহাল অবস্থা দেখে সকল স্তরের রাজ্যবাসী কেবল 'হায় হায়' ধ্বনি তুলছেন। সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমগুলিও একই পথানুগামী হয়েছে, দেখা যাচ্ছে। সকলেরই হাব-ভাবে 'গেল গেল' রবেরই আভাস মিলছে। সকাল হলেই আজ আবার কি ঘটল শোনা যাবে, কী জানি গোছের সংশয় মনে নিয়ে ঘরের দরজা খোলা চলে। কেন এই পরিস্থিতি? উত্তর হল—রাজ্য-রাজনীতি আজ নানা ধরনের ভয়ংকর ব্যাধিকবলিত এবং নিরাময়করণের উপায় না খুঁজে কেবলই দেখা যাচ্ছে, সকলে মিলে হা-হুতাশই প্রকাশ করছে। ভুলে যাচ্ছে যে, হতাশা ব্যাধি আরও বাড়ায় এবং সেই কারণে ব্যাধির হেতুগুলি নির্ণয় করে সেসবের দূরীকরণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা রাজ্যবাসীর আশুকর্তব্য। সেই লক্ষ্যের কথা ভেবে দু'চারটি ভাবনা তুলে ধরা যাক। ব্যাধি বাসা বেঁধেছে আসলে রাজনৈতিক দলগুলির নেতা-নেত্রীদের মাথায়। অতএব 'তাগা বাঁধবে কোথায়?' গোছের জিজ্ঞাসা জাগছে সকলের মনেই। মূল ব্যাধিটি হল হিসেবি বুদ্ধি সেটি ঘাঁটি গেড়েছে রাজনীতির কর্ণধারদের মস্তিষ্কের গহ্বরে—এই সত্যটি সকলে বুঝে উঠতে পারছে না। এটুকুই সব নয়, এই হিসেবি বুদ্ধি তারা ঢালাও প্রক্রিয়ায় বিতরণ করছে তাদের শিষ্যদের এবং তার ফলে হিসেবি বুদ্ধির ফলন ফলছে রাজ্যজুড়ে গ্রাম-শহর সবখানে। তাদের বাড়-বাড়ন্ত কাউকে রেহাই দিতে চাইছে না। শিক্ষিত, সুবিধাভোগী নাগরিকমহলও সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি চর্চার পাশাপাশি হিসেবি বুদ্ধির কারবারি হওয়াতে পিছিয়ে থাকছে না। তারই ফলশ্রুতি হিসেবে রাজ্য জুড়ে রাজ্য-রাজনীতির পথভ্রষ্টতা-প্রসূত সামাজিক মন ও মনুষ্যত্ব-বিনাশী ভয়াবহ সব আচার-আচরণে অভ্যস্ত ও লিপ্ত হতে দেখা যাচ্ছে সব বয়সি রাজ্যবাসীদের। রাজ্য জুড়ে বিস্তারিত হয়ে পড়ছে আশঙ্কা, আতঙ্ক ও অজানা অন্ধকারময় ভবিষ্যৎ-ভাবনা রাজ্যবাসীর মনে। কেন এমন ঘটছে? বোঝার চেষ্টা করা যাক।

বিতর্ক নয় বিবাদ, মতবাদ নয় নিন্দাবাদ-ই এখন রাজনীতির মূলমন্ত্র

রাজ্যে রাজনীতির ধারক-বাহকরা এখন তথ্য ও যুক্তিনির্ভর বিতর্ক অবলম্বন করে শিষ্যদল গঠন বা বিভিন্ন দলমত বিশ্বাসীদের মধ্যে আলোচনার পরিসর গড়ে তুলে দেশের সমস্যা-সমাধান কল্পে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিশ্বাসী নন। তাঁরা আজ তার বদলে বিবাদ-কলহ-চিৎকার-অকথা-কুকথা ব্যবহার, এককথায় গলাবাজি করে, জয়ী হওয়ার পন্থাবলম্বনে আস্থাশীল।

নেহরুবাদ, গান্ধীবাদ, মার্কসবাদ বা এইরকম কোনও মতবাদ বা মতাদর্শ আজ আর নেতা-নেত্রীরা মানেন না, জানেনও না এবং সেসব শেখা ও শেখানোর পন্থায়ও বিশ্বাস রাখেন না। তাঁরা একটিই তত্ত্ব বা বাদ (!) আজ মানেন এবং তা সদলবলে প্রয়োগ করাতে নিষ্ঠা ও পরিশ্রম ব্যয় করেন এবং সেটি হল নিন্দাবাদ।

শিষ্যদের দলানুগত করতে এবং বিরোধী বা প্রতিপক্ষ দলগুলিকে পরাজিত করে অবলুপ্তির পথে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য এই নিন্দাবাদ তাঁদের প্রধান অবলম্বন। তবে প্রধান হলেও এটি তাঁদের একমাত্র হাতিয়ার নয়। এই হাতিয়ারকে সক্রিয় করার জন্য তাঁরা সাহায্য নেন তাঁদের নিজেদের হিসেবি বুদ্ধির ও শিষ্যদের সংহার শক্তির।

নেতা-নেত্রীদের হিসেবি বুদ্ধি যে মহাকাণ্ড বাঁধায় তা হল দলানুগতদের হিংসাবৃত্তিতে ইন্ধন জুগিয়ে মারণ-যজ্ঞের আয়োজন। সে যজ্ঞে যারা আত্মাহুতি দেয় তারা মরে বেঁচে যায় আর যারা বেঁচে থাকে তারা বাঁচার জন্য নেতা-নেত্রীদের হুকুমদাস বনে যাওয়াকেই প্রাণধারণের উপায় বলে মানতে বাধ্য হয়। এই প্রক্রিয়ায় নেতা-নেত্রীরা গড়ে তোলে সমাজ ও মনুষ্যত্ব বিনাশ সাধনকারী মানব-গোষ্ঠী যাদের আজ একটি গালভারী বিশেষণে বিশেষিত করছে সকলে এবং সেই বিশেষণটি হল 'সমাজ বিরোধী'। কিন্তু মহাসত্য হল, তারা কেউই স্বেচ্ছায় সমাজ ধ্বংসের কাজে নামে না। হিসেবি-বুদ্ধির রাজনীতি নামক রঙ্গালয়ের নায়ক-নায়িকারা নিত্যদিন তাঁদেরও 'হিসেবি বুদ্ধি'র নেশায় বুঁদ করে দিয়ে সমাজে ভাঙন ধরিয়ে দেশীয় সম্পদ লুটেপুটে নেওয়ার মত্ততায় মগ্ন থাকছেন। তাতে নষ্ট হচ্ছে গ্রামীণ মানুষের জীবন, নগর-জীবন, প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ এবং সর্বোপরি দেশের মানব-সম্পদ। রাজনীতিকরা তুমুল উৎসাহে দুর্বৃত্তায়ন নির্ভর রাজনীতি নামক একধরনের অত্যাধুনিক রাজনীতির জন্ম দিয়ে নির্লজ্জ নির্বিবেক আচরণে নিজেদের ব্যস্ত রেখে তার লালন-পালন করে চলেছেন। সুস্থ, শান্তিপূর্ণ, জীবনযাপনে আস্থাশীল, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন রাজ্যবাসী সেসব দেখে রাজ্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সংশয়াকুল হয়ে পড়ছেন। কেন এমন সংশয়?

দুর্বৃত্তায়ন প্রক্রিয়ায় নষ্ট হচ্ছে মানুষের সামাজিক মন ও মনুষ্যত্ব

গ্রাম যদি হয় মাটি তাহলে শহর হল আকাশ। মাটিতে দাঁড়িয়ে প্রাণ পেয়ে এবং আকাশের দানে সমৃদ্ধ হয়ে কাটে আমাদের দেশের মানুষদের জীবন। মাটি ও আকাশ তথা গ্রাম ও শহরের সম্মিলনে বেঁচে আছে আমাদের দেশীয় সমাজ-ব্যবস্থা। পারস্পরিক নির্ভরতাই এই জীবনের মূল চালিকাশক্তি। নেতা-নেত্রীরা সেই সমন্বয়কে বিনষ্ট করে দিয়ে সকল শক্তি নিজেদের পকেটস্থ করতে চায়। গ্রামের মানুষরা রাজনৈতিক দলীয় বিভাজনের বার্তা শিখে নিয়ে রক্তারক্তি, হানাহানি বাধায় নিজেদের মধ্যে। গ্রামঘাতী সেই হিংসাত্মক কাণ্ড ঘটানোর মূল ভূমিকায় থাকেন নেতা-নেত্রীরা। গ্রামীণ সমাজ নষ্ট হয়। এই নষ্টামি দেশের ভবিষ্যৎ ধ্বংসসাধক কাণ্ড।

শহরের চিত্র এত খারাপ নয় এই অর্থে যে, শহরজীবনে শহরবাসীদের সামাজিক বন্ধন গ্রামবাসীদের মতো নয় বলে ওই বন্ধন নষ্ট হওয়ার কাণ্ডটি মারাত্মক হয় না। কিন্তু শহরের সুবিধাহারা মানুষজনেদের নিজেদের দলভুক্ত করার নিরন্তর চেষ্টায় নেতা-নেত্রীরা দলানুগত্য লাভের হিসেবি বুদ্ধিটা তাদের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিয়ে নিজেদের লাভের জন্য জরুরি কাজগুলি করিয়ে নিতে পারে সহজেই তাদের দ্বারা। শহরের শান্তি তখন দূরে পালাতে পথ পায় না।

সুবিধাভোগী বিদ্বজ্জনরাও এ-কাজে নেতা-নেত্রীদের সাথী হতে আজ আর তেমন পিছিয়ে থাকেন না। লাভালাভের হিসেব ভুলে বিশুদ্ধ বিদ্যা-শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চায় আজ তাঁরা ডুবে থাকতে পারেন না এবং থাকাটা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক বলে গণ্য করেন না। কেউ কেউ আবার অন্যায়-অত্যাচার-অনাচার রাজ্যজুড়ে ঘটছে দেখেও নীরব থাকাটাই শ্রেয় পন্থা মনে করে নিশ্চুপ থাকেন। এভাবে ঊর্ধ্বে অবস্থানকারী নাগরিক সমাজ যে মলিনতা-মাখা হয়ে যাচ্ছে সে সম্পর্কে নেতা-নেত্রীরা সহ নাগরিক সমাজের একাংশ নির্বিকার।

মানব ও মানবীর পরস্পর মিলনে ও সহযোগিতায় গড়ে ওঠে ও বেঁচে থাকে পরিবার ও সমাজজীবন। উভয়ের মধ্যে আজ ভোগী ও ভোগ্যের সম্পর্ক চিনিয়ে দিচ্ছে নতুনভাবে আজকের সময়ের রাজনীতি। শিষ্যরা যেমন খুশি নারীদেহ ভোগে উল্লসিত হোক ও থাকুক, তাতেই নেতা-নেত্রীদের শিষ্যগোষ্ঠী ভরে উঠবে! সামাজিক মনের বিনষ্টি নিয়ে ভাবতে গেলে তাদের চলে না! চলতে পারে না!

শিক্ষা নাকি জাতির মেরুদণ্ড গড়ে দেয়! নেতা-নেত্রীদের সেকথা ভেবে কী লাভ! তাতে কি নিজের বা দলের তহবিল ভরবে? ভরবে না। অতএব ওসব পুরনো দিনের আদর্শ-টাদর্শ ভুলে যাও। শিক্ষকদের বেদম মার আর শিক্ষার্থীদের মদে

ক্ষমতার নেশায় আসক্ত ও আকৃষ্ট করে দলের ভার বাড়াও। সেটাই একমাত্র পন্থা দলের আয়ু ও ক্ষমতাবৃদ্ধির! লেখাপড়া জানা, না-জানা সবই সে লক্ষ্যসাধনে অভিন্ন ব্যাপার। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির মাথায় বসানো যাক লেখাপড়া না জানা দলানুগত সমাজটমাজের ভাবনা ভূতে না ধরা শিষ্যগুলিকে। ব্যস। আর পায় কে! পকেট ভরুক। ঝুলি ভরুক। দল বাড়ুক।

হাসপাতাল স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে মানুষ রোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে, মৃত্যুর হাতছানি থেকে বাঁচতে চিকিৎসকদের হাতে নিজেদের সঁপে দেয় গভীর বিশ্বাসে এবং অপরিসীম অসহায়তায়। সেই চিকিৎসকদের দলে ভেড়াতে হবে। নেতা-নেত্রীদের নজর তরুণ মেধাধারী জীবগুলির দিকে। একসঙ্গে চিকিৎসক ও রোগী দুই গোষ্ঠীকেই জালে তোলা যাবে। অতঃপর হিসেবি বুদ্ধি ভুলিয়ে দেয় এই দুই গোষ্ঠীকেও। মানবিকতার বন্ধনকে তখন তাদের নাগপাশ বলে বোধ হয়। চলতে থাকে তাদের সামাজিক তথা একে অপরের সঙ্গে-সাথে থেকে জীবনের পথ চলার সদিচ্ছা পোষণকারী মনের নিধন কাণ্ড।

আর সাধারণভাবে রাজ্যবাসীর জীবনে এসবের কি একটুও প্রভাব পড়ে না? পড়ে এবং আমরা সবিস্ময়ে সেসব লক্ষ করে আতঙ্ক বোধ করি। স্বার্থপর মনের উন্মেষ ঘটছে দেখছি তুমুল প্রতাপে অধিকাংশ মানুষের অভ্যন্তরে। সকলের অগোচরে তার ভয়াবহ বৃদ্ধি ঘটছে। 'সকলের তরে সকলে আমরা' এই নীতি ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সকল ব্যাধির ওপরে ঠাঁই করে নিচ্ছে আজ মানুষের স্বার্থপরতা ব্যাধি এবং সেই ব্যাধির উৎপাদকদের মধ্যে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে আজকের হিসেবি বুদ্ধি নামক ব্যাধিকবলিত রাজনীতি। প্রশ্ন হল—তাহলে উপায়? নিরাময় কোন পথে সম্ভব? সেকথা বলেই শেষ করা যাক।

প্রতিটি রাজ্যবাসী নিজের দিকে আঙুল তুলুক

রাজনীতিকরা আজ দিকভ্রষ্ট, লক্ষ্য ভুলে যাওয়া জীবনের পথযাত্রী। আমরা রাজ্যবাসীরা কেবল তাদের উপর সব অরাজকতার দায়ভার চাপিয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকব? নিজেদের এতটুকুও দায় আছে কি না—ভাবব না? না যদি ভাবি, তাহলে হা-হুতাশ করাই সার হবে আর যেটি আমরা সকলেই জানি সমূহ দুর্বলতা এবং কর্তব্যবোধ ও দায়ভারহীনতার লক্ষণ। ভুললে চলবে না যে, 'এ আমার, এ তোমার পাপ'। নিজ নিজ করণীয় কর্তব্যটুকু কেবল ব্যক্তির নিজের ও পরিবারের জন্য নয়। মানুষ সামাজিক জীব বলে একা বাঁচতে পারে না। তাকে তাই নিজের জন্যই অন্যের কথা ভাবতে হয়। আর সেই ভাবনা থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখে নিষ্ক্রিয় জীবন-যাপনের নাম মানবজীবন হতে পারে না। বেশি কিছু করারও প্রয়োজন নেই। কেবল সকল কাজে দুটি নীতি যদি আমরা সকলেই মানি তাহলে হিসেবি বুদ্ধির কারবারিরা আর কখনওই ফুলে ফেঁপে উঠতে পারবে না এবং রাজ্য বা দেশ থেকে পালাবারও পথ খুঁজে পাবে না। তারা সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

এক. আমরা যেন প্রত্যেকে নিজেদের কথা ও কাজে মিল রাখতে সজাগ থাকি।

দুই. যদি জীবনের অপর সহযাত্রীদের জন্য ভালো কিছু নাই করতে পারি, তাদের ক্ষতি হবে এমন কোনও কাজ যেন না করি কখনও।

শিক্ষার আজ কাল পরশু—কিছু জিজ্ঞাসা

দূর্বাদল দত্ত

শিক্ষা এমন একটি বিষয় যা নিয়ে সকলেই কথা বলেন, আলোচনা করেন, এমন কি ভাবেনও। কারণ অসংখ্য। বইয়ের কথায় শিক্ষা হল পড়ুয়ার আচরণের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন। অনেক পড়ুয়ার অভিভাবকের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা উঠে আসে। যখন জিজ্ঞেস করি শিক্ষা নিয়ে বা দিয়ে কী হবে, তাঁরা অস্বস্তিতে পড়েন। উত্তরে যা যা বলেন তার একটা তালিকা দিচ্ছি :

১. না শিখলে চলে! মানুষ হতে হবে তো!
২. শিক্ষিত না হলে আকাট মুখ্যু হবে যে!
৩. লেখাপড়া ছাড়া তো চাকরি হবে না।
৪. একটা পাস না করলে মান সম্মান থাকে না।
৫. সঠিক শিক্ষা পেলে জীবনে কিছু করে খেতে পারবে।
৬. শিক্ষিত হওয়ার মূল্য আলাদা।
৭. সবার ছেলেমেয়ে লেখাপড়া করে, আমারটা কেন পড়বে না!

স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা যেমন চলে তেমনি এর বাইরেও প্রতিনিয়ত শিক্ষার অজস্র উপকরণ ছড়িয়ে আছে প্রতিদিনের জীবনের পাতায়। আজ সব থেকে বড় প্রশ্ন যেটা—কোথায় গেলে শিক্ষাটা সম্পূর্ণ হয়? শুধুমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়লেই কি শিক্ষা হবে? একেবারেই না। পাশাপাশি সমান্তরাল ভাবে চলছে প্রাইভেট টিউশন পড়ার রেওয়াজ। বেশি করে। স্কুল-কলেজে ভর্তি, রেজিস্ট্রেশন আর বছরে দু'একদিন গেলেই হবে কারণ ওখানে তো কিছু হয় না (?)। 'মাস্টাররা' 'ফাঁকিবাজ'! আসল কারণগুলোই উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে। প্রতিটি বিদ্যালয় আজ ধুঁকছে। সরকারি বিদ্যালয়গুলো আজ নানারকম সংকটে। স্কুলের প্রশাসন ব্যস্ত মিড-ডে-মিল ও নানা 'শ্রী' নিয়ে। নানান অভিযোগও আসছে এ নিয়ে। 'শিক্ষা না হোক খাঁচাটা মজবুত হোক' জাতীয় এক ভাবনায় আচ্ছন্ন প্রশাসনের প্রচুর অনুদান এসেছে ঘরবাড়ির মতো পরিকাঠামো উন্নয়নে। সবার জন্য শিক্ষা ও গুণগত মানে উৎকৃষ্ট শিক্ষার নীতি সরকারি ভাবে গৃহীত নীতি। এ নীতি প্রশংসার দাবি রাখে। কিন্তু এই নীতির বাস্তবায়নের জন্য সরকারের যে দায়ভার বহন করা উচিত, যে শিক্ষা পরিকাঠামো গড়ে তোলা দরকার, পড়ুয়া-শিক্ষক অনুপাতটিকে যে গুরুত্ব দিয়ে ভাবা উচিত, সেসবের বালাই নেই। বর্তমানে শহরাঞ্চল ছাত্রশূন্য স্কুল ও শিক্ষকে ঠাসা আর মফস্বলের স্কুলগুলোতে ঠিক

উল্টো ছবি। চাহিদা-জোগানের এই ফারাক ক্রমশ সমাজে এই বার্তা দিচ্ছে যে সরকারি স্কুলে কিছু হয় না। প্রাইভেটে সবটা হয়। দিন দিন বেসরকারি, বিশেষত ইংরেজি-মাধ্যম সুসজ্জিত ঝাঁ-চকচকে মিড-ডে-মিল বিহীন, স্কুলের সংখ্যা বাড়ছে এবং সমাজে একটা প্রবণতা (বলা ভালো চাহিদা) তৈরি হয়েছে এই জাতীয় স্কুলের জন্য। অভিভাবকরা সন্তানের মঙ্গল কামনায় এই বেসরকারি উদ্যোগকে শক্তি জোগাচ্ছেন। প্রলুব্ধও হচ্ছেন এইসব স্কুলের প্রতি।

এখন এই প্রশ্নগুলো আরও বেশি করে আলোচনা করা দরকার। সমাজের সব স্তরেই। শিক্ষার অধিকার আইনকে বাস্তবায়িত করার জন্য সরকারি উদ্যোগ কি যথেষ্ট? শিক্ষা insvestment না consumption? দেশের জনগণকে শিক্ষিত করার দায় দায়িত্ব কার—ব্যক্তির না সরকারের? জাতীয় আয়ের যেটুকু শিক্ষা খাতে বরাদ্দ করা হয় তা কি উৎকৃষ্ট শিক্ষার প্রসারে যথেষ্ট? স্বাধীনতার পর থেকে অনেকগুলো কমিশন ও কমিটির সুপারিশগুলোর কতটা সরকারি নীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে? যেটুকুও বা গৃহীত হয়েছে তারই বা কতটা বাস্তবায়ন ঘটেছে? মার্কসিটের নম্বরের সঙ্গে শিক্ষার্থীর শেখা না-শেখা কতটা সম্পর্কিত? মৌখিক পরীক্ষার বদলে যে প্রকল্প রাজ চলছে বিদ্যালয় শিক্ষায় তা কি শিক্ষার মানোন্নয়নে সহায়ক হয়েছে? জাতীয় শিক্ষানীতি—২০০৫ অনুসারে আজও চালু শিক্ষা কার্যক্রমের কি সত্যিই যথার্থ মূল্যায়ন হয়েছে? সেই মূল্যায়নকে ভিত্তি করেই কি সর্বশেষ জাতীয় শিক্ষানীতি নেওয়া হয়েছে? নতুন শিক্ষানীতি চালু করার জন্য বা নতুন শিক্ষানীতি অনুসারে পাঠ্যবই ও পঠনপাঠন শুরু হওয়ার আগে কর্মরত শিক্ষকদের কি যথাযথভাবে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে বা হচ্ছে?

ভেবে দেখুন আপনার মনেও হয়ত অসংখ্য জিজ্ঞাসা দানা বাঁধছে আজকের দিনে। উন্নত দেশে শিক্ষা একই সঙ্গে একক ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ও সামাজিক বিকাশকে সুনিশ্চিত করে। আমাদের দেশে? আমাদের রাজ্যে? লাখ লাখ এম.এ, এম.এসসি বেরিয়েছে পাশ করে। পড়াশুনোর দ্বার উন্মুক্ত। প্রচুর সংখ্যক পিএইচ.ডি. বাড়িতে বসে হতাশায় আত্মগ্লানিতে দিন কাটাচ্ছে। আমরা যদি ইতিহাসের পানে ফিরে তাকাই অজস্র উজ্জ্বল উদাহরণ আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আজ থেকে প্রায় এক হাজার বছরের আগে আলফ্রেড দ্য গ্রেট (৮৪৮-৮৯৯) যখন অ্যাংলো স্যাক্সনদের রাজা হন, তিনি বুঝেছিলেন দেশের মানুষকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। ব্যবস্থাও করেন প্রজাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে। সুপ্রাচীন কাল থেকেই কোনো এলাকার উন্নয়নের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি হল গণশিক্ষা। আজও তাই। এবং কোনো দেশের শিক্ষার মানের একটি মাপক হল শিক্ষক-শিক্ষিকার জীবন যাত্রার মান যা নির্ভর করে বেতনের উপর। আমাদের দেশে শিক্ষা ও শিক্ষকের মান, মাপা সম্ভব কোন মাপনী যন্ত্রে? সমাজ ও সরকার শিক্ষাকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে অতি অবশ্যই শিক্ষকতার পেশাকে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে যাতে উচ্চমেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা এই পেশার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং শিক্ষার মানোন্নয়ন ঘটে। উন্নত দেশে শিশুদের জন্য নিযুক্ত শিক্ষকদের মর্যাদাপূর্ণ সামাজিক অবস্থান প্রমাণ করে শিক্ষার উৎকর্ষতা বৃদ্ধির কাজটি সকলের জন্য নয়। শিক্ষকতা একটি ব্রত এবং অবশ্যই পেশা। আচ্ছা, আমাদের রাজ্যে শিক্ষকদের বেতন কাঠামো ও সুযোগ সুবিধার বর্তমান অবস্থাটা কেমন? সত্যিই কি চালু বেতন কাঠামো শিক্ষকতার পেশাকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে? উচ্চমেধাকে শিক্ষকতার পেশায় আকৃষ্ট করার কোনো ব্যবস্থা কি নেওয়া হচ্ছে? বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষকদের বর্তমানে পরিচয়ের ও সম্মানের সংকটটা কীভাবে কাটানো সম্ভব? বাঙালি জাতির পূজনীয় শিক্ষককুলকে (রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ডিরোজিও, রবীন্দ্রনাথ) কি আজ আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি? সে অবসর বা অবকাশ কি আমাদের আছে? ভেবে দেখা দরকার।

আজকের দিনে যে সমস্ত সমস্যা সম্পর্কে ছাত্রসমাজকে সচেতন করা প্রয়োজন বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা কি সে কাজ করতে সমর্থ? পরিবেশের কথাই ধরা যাক। জীববৈচিত্র্য যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তাতে কি বৈচিত্র্যপূর্ণ ইকোসিস্টেমগুলো, যা পরিবেশের পক্ষে ও মানুষের অস্তিত্বের পক্ষে কল্যাণকর, রক্ষা করা সম্ভব হবে? অপরিকল্পিত নগরায়ন ও শিল্পায়ন পরিবেশকে যেভাবে নষ্ট করছে তার থেকে পৃথিবীকে জীবন প্রবাহের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা কি সম্ভব হবে? বর্তমান পাঠক্রম কি পরিবেশ সচেতন নাগরিক গড়ে তুলতে সমর্থ? জ্বালানি সংকট ও বিশ্ব উষ্ণায়ন থেকে মুক্তির দিশা কি এই পাঠক্রম দিতে পারে? সাম্প্রতিক করোনা ভাইরাসের দাপট থেকে প্রাণহানি ও হাহাকারের যে ছবি দেখা গেল বিশ্ব জুড়ে তার থেকে আমরা কি শিক্ষা গ্রহণ করব না? নদী-খাল-বিল দ্রুত শুকিয়ে যাচ্ছে মানুষের ক্রমাগত অত্যাচারে। এ ব্যাপারেও কি বর্তমান প্রজন্মকে সচেতন করার প্রয়াস বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় আছে? ইন্টারনেট ও স্মার্টফোনের দাপটে যে সামাজিক ও মানসিক অবক্ষয় হচ্ছে তাকে প্রতিহত করার উপায় কি বর্তমান শিক্ষাক্রমে আছে? শিক্ষা কি শুধু জ্ঞান অর্জনের গণ্ডিতে

আবদ্ধ থাকবে? নম্বর পাওয়ার এই প্রতিযোগিতা কি চলতেই থাকবে? অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ফর্মেটিভ মূল্যায়ন বাস্তবে যে রূপ নিয়েছে তার কি মূল্যায়ন হবে না? দিন যায়। শিক্ষার নিয়ম নীতি পাঠক্রম পাঠ্যসূচি বদলায়। কিন্তু আমাদের বিদ্যা অর্জন কি যথাযথ শিক্ষিত দায়িত্বশীল নাগরিক তৈরিতে সক্ষম? এ জাতীয় অজস্র প্রশ্ন জাগছে মনে। তারই কিছুটা ভাগ করে নিচ্ছি আপনাদের সঙ্গে। জানি শিক্ষানীতি প্রণয়নে আপনার আমার মতামত উপেক্ষিতই থেকে যাবে। সরকার যা চাপিয়ে দেবে তাকেই বিনা বাক্যব্যয়ে সর্বোৎকৃষ্ট বলে মেনে নিতে হবে। শিক্ষা আর কতদিন পড়ুয়াদের কাছে বোঝা হয়ে থাকবে? কর্মসংস্থানের সঙ্গে, চাকরি বাজারের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন শিক্ষা বর্তমান ও ভাবী প্রজন্মকে যে হতাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত করছে ও করবে তার থেকে মুক্তির উপায় কী? লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত বেকারের চোখের জল কি কোনো পরিবর্তন আনবে ? না, দুর্নীতির পাহাড় ক্রমশ দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে-উচ্চতায় আরো বৃহৎ আকার ধারণ করবে? ক্রমাগত চর্চা চলুক, প্রতিবাদী চেতনা জাগ্রত হোক সমাজে।

আজকের পঠনপাঠন, শিক্ষাপ্রশাসন, পরীক্ষা ও মূল্যায়ন শিক্ষাকে যে স্তরে নামিয়ে এনেছে, ইতিহাস কি তাকে ক্ষমা করবে ? সর্বোপরি, শিক্ষক সমাজও কি ক্রমশ ''ব্রতহীন ব্রাত্য প্রজাতি''তে রূপান্তরিত হবে?

সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতির আবর্তের বাইরে বেরিয়ে গড়ে তুলতে চাই ঐক্যবদ্ধ বৃহৎ প্ল্যাটফর্ম

কিংকর অধিকারী
সাধারণ সম্পাদক

লাল, নীল, সাদা, সবুজ, গেরুয়া রংগুলো দখল করে নিয়েছে বিভিন্ন দল। আমাদের জায়গা গুলো ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। নিজেরা পিছু হটছি, আর দুষ্টু শক্তিদের পথ প্রশস্ত করে দিচ্ছি। অভিজ্ঞতাগুলো একবার তলিয়ে দেখুন বুঝতে পারবেন কোনো শাসক আমাদের মুশকিলাসান হতে পারে না। তার জন্য চাই শাসক বা বিরোধীদের কোন দিকেই না ঝুঁকে সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে ন্যায়সঙ্গত লড়াই গড়ে তোলা। কেবল বিশেষ দু-একটা দাবি আদায়ের লক্ষ্য নয়, এমন একটা সংঘবদ্ধ শক্তি গড়ে তুলতে হবে যাকে শুধু আজকের শাসক নয়, আগামীর কোনো শাসকও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করার সাহস পাবে না। সেই ভিত্তি রচনার দায়িত্ব নিয়েছে শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চ।

কাদের নিয়ে এই সংগঠন? এই সংগঠনের দাবিগুলিই বা কী? ২০১৮ সালে রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনে সাংবিধানিক অধিকারকে তুড়ি মেরে ভোট কর্মীদের সাংবিধানিক অধিকারকে লুণ্ঠন করা হয়েছিল। নামিয়ে আনা হয়েছিল আক্রমণ। সম্মান, মর্যাদা ভুলুণ্ঠিত হয়েছিল। ভোটারদের নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী ভোট দানের গণতান্ত্রিক অধিকারও লুণ্ঠিত হয়েছিল। প্রিসাইডিং অফিসারের দায়িত্ব পালনের সময় তরুণ শিক্ষক রাজকুমার রায়কে লাশ করে দেওয়া হয়েছিল। আরো হাজার আক্রমণের নজির সৃষ্টি করেছিল সেই নির্বাচন। এর আগে কোনদিন কোন আক্রমণ বা ভোট লুট হয়নি একথা আমরা মনে করি না। কিন্তু ২০১৮ সালের ঘটনা বীভৎসতার চরম সীমায় পৌঁছেছিল। এর বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদকে সংগঠিত করে আগামীতে শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার তাগিদেই গড়ে উঠেছিল শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চ। ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনে প্রতিটি বুথে সেন্ট্রাল ফোর্সের দাবীকে মেনে নিতে বাধ্য

হয়েছিল নির্বাচন কমিশন। দাবি মেনে জারি করা হয়েছিল প্রেস নোট। নির্বাচন প্রক্রিয়া নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছিল।

এছাড়া শিক্ষাকে রক্ষার প্রশ্নে, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের পেশাগত সমস্যার সমাধানে, বঞ্চিত চাকরি প্রার্থীদের বঞ্চনার বিরুদ্ধে দুর্নীতিমুক্ত নিয়োগের দাবিতে, দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে আন্দোলন সংগঠিত করেছে। আইনি লড়াই এবং রাস্তার লড়াই দুইভাবে সংগঠন সচেষ্ট রয়েছে।

শুধু একক আন্দোলন নয়, দল-মতের উর্ধ্বে উঠে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টাও আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। আমরা মনে করি বিভিন্ন সংগঠনগুলিকে নিয়ে দীর্ঘস্থায়ী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে গেলে তার বেশ কিছু শর্ত রয়েছে তা আমাদের মেনে চলতেই হবে। কোন্ কোন্ শর্তে যৌথ আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ীভাবে টিকে থাকবে?

১) আর্থিক দিক: একক বা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের জন্য অর্থের প্রয়োজন। অর্থ কোনদিন আন্দোলনের অন্তরায় হতে পারে না। বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি হলে শিক্ষক, কর্মচারীগণ যে প্রাণ ভরে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন তার অনেক নজির রয়েছে। কিন্তু বিশ্বাস যোগ্যতা ধরে রাখতে গেলে স্বচ্ছ কাচের মতো পরিষ্কার মন নিয়ে তা করতে হবে। সকলের কাছে বিশ্বাসযোগ্য তথ্যের মাধ্যমে তা তুলে ধরতে হবে। প্রতিটি সংগঠনের নেতৃত্বরা যেন হাতের তালুর মত সমস্ত বিষয়ে অবগত থাকেন।

২) বিরুদ্ধ মতকে মর্যাদা দেওয়া: বহু সংগঠনকে নিয়ে চলতে গেলে বহু মত আসবে - সেটাই স্বাভাবিক। তা নিয়ে যুক্তিতর্কও চলতে পারে। সেখান থেকে যুক্তিসঙ্গত বিষয়গুলিকে গ্রহণ করতে হবে। অন্য কারো মতের গুরুত্ব না দিয়ে 'আমি বা আমরা কয়েকজন যেটা বলব সেটাই সঠিক' এই মানসিকতা ঐক্যবদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনকে ধ্বংস করে দেয়। তা থেকে বিরত থাকতে হবে।

৩) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন দলীয় রাজনীতির প্রভাবে প্রভাবিত না হয়ে শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, সরকারি কর্মচারী সহ সকলকে তাঁদের নিজেদের মর্যাদা ও অধিকার আদায়ের লড়াইতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। যার গুরুত্ব অপরিসীম এবং এর শক্ত ভিত্তি হঠাৎ করে টলানো যায় না। এই শক্তিকে শাসক বরাবর ভয় পায়।

৪) রাজনৈতিক ক্ষমতা বদলের দায় নেবে না: এ লড়াইয়ের ময়দান থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা বা পালাবদলের ডাক দেবে না। বরং দিন বদলের আকাঙ্খাকে জাগিয়ে তুলবে যার মধ্য দিয়ে মানুষ তার সঠিক পথ বেছে নেবে। কেননা, কোন শাসক সকল শিক্ষক, কর্মচারী, শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের মুশকিলাসান হতে পারেনা। এ লড়াই নিরন্তর জারি থাকবে যে কোন শাসকের অন্যায়ের বিরুদ্ধে।

৫) ঐক্যবদ্ধ সংগঠনগুলিকে নিয়ে নিয়মিত আলাপ, আলোচনা, যুক্তি, তর্কের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অন্যতম আরেকটি শর্ত।

৬) রুচি সংস্কৃতির জায়গাটি ধরে রাখা: যৌথ আন্দোলনে এমন কিছু স্লোগান বা বক্তব্য আসবে না যার মধ্য দিয়ে সামগ্রিকভাবে শিক্ষক কর্মচারী সমাজের প্রতি মানুষের ধারণা নিম্নমানের হয়।

৭) কেন্দ্রীভূত নয়, আন্দোলনকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে গেলে জেলা, ব্লক, এমনকি কর্মক্ষেত্রে কমিটি গড়ে দায়িত্ব দিতে হবে যার মধ্য দিয়ে শিক্ষক কর্মচারীগণ স্বাধীনভাবে লড়াইয়ের তেজ পাবে।

৮) পরোক্ষভাবে যদি বিরোধী রাজনৈতিক দলের উপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়া যায় তাহলে শেষ পর্যন্ত এই যৌথ আন্দোলন থেকে উঠে আসা নেতৃত্ব সেই দলগুলির কাছে বিক্রি হয়ে যেতে পারে। তাই সম্মিলিত এই প্রচেষ্টাকে কোনভাবেই বিকিয়ে দেওয়া যায় না। সে ব্যাপারে সাধারণ শিক্ষক, কর্মচারীদের সতর্ক থাকতে হবে।

আমরা শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চ মনেপ্রাণে চাই দল-মতের উর্ধ্বে উঠে শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, সরকারি কর্মচারী মহল নিজেরাই ঐক্যবদ্ধ ভাবে নিজেদের এবং সমাজের বহু সমস্যার সমাধান করতে পারেন। সেই দীর্ঘস্থায়ী ঐক্যবদ্ধ শক্তি গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে এককভাবে যেমন আন্দোলন গড়ে তুলছি ঠিক একই ভাবে যৌথ আন্দোলন গড়ে তুলতে চাই। এ ব্যাপারে শুধু নেতৃত্বের দিকে তাকিয়ে থাকলে চলবে না সমস্ত শিক্ষক

কর্মচারীদের নিজেকে যুক্তি, বুদ্ধি, বিবেক দিয়ে বিবেচনা করতে হবে, প্রয়োজনে তীব্র সমালোচনায় বিদ্ধ করতে হবে নেতৃত্বকে। কোন মতেই যেন বিপথে না চালিত হয়। ভালোর জন্যেই তা করতে হবে। আমরা চাই তেমন একটা শক্তি পশ্চিমবঙ্গে গড়ে উঠুক। আসুন, সমস্ত শিক্ষক শিক্ষাকর্মী কর্মচারী সহ শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গ একত্রিত হই একটি ছাতার তলায়। যে সংগঠন কোনদিন কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলকে ক্ষমতাচ্যুত করার অথবা কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলকে ক্ষমতায় আনার জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামে ব্রতী হবে না। দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে ন্যায়সঙ্গত দাবি জোরের সাথে তুলে ধরবে। যাকে কোন শাসক সহজে উপেক্ষা করতে পারবে না।

শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চের ১ম রাজ্য সম্মেলনের সাফল্য কামনায় –

পুস্তক মহল

সকল প্রকার পুস্তক ও শিক্ষা সরঞ্জাম বিক্রেতা

বিশেষ ছাড়ে যে কোনও প্রকাশকের পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণির সহায়িকা পাবেন।

করিমপুর (আনন্দপল্লীপ্রবেশ পথ) * নদিয়া

বাংলাদেশের বইয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

THE UNIVERSITY PRESS LIMITED

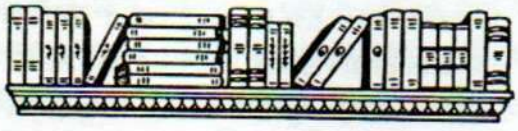

3/1, College Row,Kolkata -- 700073

Contact : 8910377900 & 9051978845

সরকারি বাংলা মাধ্যম স্কুল: বিপদ সংকেত স্পষ্ট

সুমন কল্যাণ মৌলিক

সরকারি বাংলা মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমে আসছে তার প্রধান কারণ স্কুলগুলির শিক্ষাদান পদ্ধতি, শিক্ষার গুণগত মান, ব্যবহারিক মূল্য নিয়ে অভিভাবকদের তীব্র অনাস্থা। এই অনাস্থা আজ এতটাই সর্বব্যাপ্ত যে বাংলা মাধ্যমের সরকারি স্কুলগুলোতে যারা শিক্ষাদান করেন অর্থাৎ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নব্বই শতাংশ ক্ষেত্রে তাদের সন্তান সন্ততিরা বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়ে।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থার ভালো-মন্দ আজ আদালত নির্ভর। শিক্ষা প্রশাসনের অস্বচ্ছতার কারণে আইনি-বেআইনি নিয়োগ হোক বা বদলি, মাননীয় ধর্মাবতারদের রায়ের উপর ভরসা করে বসে আছেন সংশ্লিষ্ট সব পক্ষ। এই অন্তহীন তরজার মধ্যে একটা রিপোর্ট বোধহয় আমাদের চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের দশ হাজারের বেশি স্কুলে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা তিরিশেরও কম ফলে সেই স্কুলগুলো আগামী শিক্ষাবর্ষে আদৌ চালু থাকবে কি না তা নিয়ে গভীর সংশয় দেখা দিয়েছে। স্কুলের তালিকাটা ভালোভাবে দেখলে বোঝা যায় আলিপুরদুয়ার থেকে সুন্দরবন, কলকাতা থেকে পুরুলিয়া, স্কুলে শিক্ষার্থী না থাকার সমস্যাটা সর্বব্যাপ্ত। আর এই প্রতিবেদনটা প্রকৃতপক্ষে হিমশৈলের চূড়ামাত্র কারণ তালিকাটা মূলত প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক স্কুলের, একটু খোঁজ নিলে বোঝা যাবে বহু মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের অবস্থাটাও আলাদা কিছু নয়। আর একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আজ যদি প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষার্থীদের ভর্তির হাল এই হয় তবে আগামীতে মাধ্যমিক স্কুলগুলোর জন্য শিক্ষার্থীদের আকাল দেখা যাবে। বিষয়টা এমন নয় যে এ রাজ্যে শিক্ষার্থীরা আর স্কুলে যাচ্ছে না, বিষয়টা হল অভিভাবকরা সচেতন ভাবে সরকারি বাংলা মাধ্যম স্কুলকে বর্জন করে বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলকে বেছে নিচ্ছেন। প্রত্যেক বছর মাধ্যমিকের ফল প্রকাশের পর মেধাতালিকায় কেন কলকাতার স্কুল নেই বলে মিডিয়ায় অনেক হাহুতাশ লক্ষ্য করা যায় কিন্তু এই সাধারণ সত্যটার আমরা মুখোমুখি হতে চাই না যে কলকাতা বা রাজ্যের যে কোনও বড়ো শহরের উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত বাড়ির ছেলেপিলেরা অনেকদিন আগেই বাংলা মাধ্যম স্কুল ছেড়েছে।

শিক্ষা বিজ্ঞানে পড়ানো হয় যে শিক্ষার মান উন্নয়নে, শিক্ষার্থীর স্কুলের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি করতে শিক্ষার পরিকাঠামো উন্নয়ন আবশ্যিক শর্ত। সেই মানদণ্ডে বিচার করলে বিগত সময়ে রাজ্যের সরকারি স্কুলগুলির ভোল অনেকটাই পাল্টেছে। অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ, পানীয় জলের ব্যবস্থা, শৌচালয়, বিদ্যুৎ এখন প্রায় সব স্কুলেই উপলব্ধ। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে কম্পিউটার, স্মার্ট ক্লাসরুম, প্রজেক্টর আজ আর মঙ্গলগ্রহের বস্তু নয়। প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে বই, খাতা, পোশাক, স্কুল ব্যাগ এবং নবম, দশম শ্রেণির জন্য সাইকেল এবং অতিমারী পর্ব থেকে একাদশ , দ্বাদশ শ্রেণির জন্য মোবাইল ফোনের ব্যবস্থাও রয়েছে। নানান সমস্যা থাকলেও সারা রাজ্যে মিড ডে মিল এখন অনেকটাই নিয়মিত। অ্যানুয়াল স্ট্যাটাস অব এডুকেশনের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনেও এই বিষয়গুলি স্বীকৃত। এছাড়াও রয়েছে কন্যাশ্রী ও নানান ধরনের অনুদান যা একটা বড়ো অংশের ছাত্র , ছাত্রীদের ভাগ্যে জুটছে। সর্বোপরি এখনো পর্যন্ত সরকারি স্কুল শিক্ষার বেশিরভাগটাই অবৈতনিক। একটা দীর্ঘ সময় ধরে বাংলা মাধ্যমের স্কুল শিক্ষার ক্ষেত্রে অভিযোগ ছিল প্রশ্নপত্রের জটিল ও বর্ণনাত্মক ধাঁচের জন্য নাম্বার তোলা কঠিন। সে অভিযোগেরও নিষ্পত্তি হয়েছে অনেকদিন। দিল্লি বোর্ডের মত এরাজ্যেও আজ প্রশ্নপত্রের ষাট শতাংশ নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন, নবম থেকে দ্বাদশে প্রজেক্টও চালু হয়েছে। ফলত 'ঝুড়ি ঝুড়ি' নাম্বার পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনও অসুবিধা নেই। এত আয়োজন সত্ত্বেও সরকারি বাংলা মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমে আসছে তার প্রধান কারণ স্কুলগুলির শিক্ষাদান পদ্ধতি, শিক্ষার গুণগত মান, ব্যবহারিক মূল্য নিয়ে অভিভাবকদের তীব্র অনাস্থা। এই অনাস্থা আজ এতটাই সর্বব্যাপ্ত যে বাংলা মাধ্যমের সরকারি স্কুলগুলোতে যারা শিক্ষাদান করেন অর্থাৎ শিক্ষক- শিক্ষিকাদের নব্বই শতাংশ ক্ষেত্রে তাদের সন্তান সন্ততিরা বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়ে। এই তালিকাটা প্রকাশের পর সম্ভাব্য বদলির আকাঙ্ক্ষায় ভীত এক শিক্ষিকা সোসাল মিডিয়ায় মন্তব্য করেন, কেন শহরের স্কুল উঠে যাবে, শহরে কি গরিব নেই! পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে পকেটে পয়সা থাকলে অভিভাবকেরা তাদের সন্তানকে বাংলা মাধ্যম স্কুলে ভর্তিই করবেন না।

এই অনাস্থা এবং অধোগমন সাম্প্রতিক সময়ে বেগবান হয়েছে একথা সত্য কিন্তু সমস্যার শুরু আরো আগে থেকেই। অনেকে বলেন প্রাথমিক সিলেবাসে ইংরেজি বিসর্জন থেকে সমস্যার শুরু। একথা ঠিক যে পরিকল্পনাহীন ভাবে হঠাৎ করে ইংরেজি তুলে দেওয়া এবং পরে পিছনের দরজা দিয়ে ইংরেজিকে ফিরিয়ে আনা অভিভাবকদের বিক্ষুব্ধ করেছিল কিন্তু আর্থিক অসামর্থ্য ও ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলের স্বল্পতার কারণে বাংলা স্কুলের থেকে শিক্ষার্থীরা পালিয়ে যায়নি। অবস্থার পরিবর্তন ঘটল নব্বই এর দশকে যখন এদেশে বিশ্বায়ন চালু হল। মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং সরকারি কর্মচারীদের পে- কমিশন ও ওয়েজ বোর্ডের কল্যাণে ভারতে এক নব্য মধ্যবিত্ত সমাজের জন্ম হল যাদের চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষার গল্পটা ভিন্ন। একই সঙ্গে এই নতুন জমানায় শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সবচেয়ে উদীয়মান বাণিজ্যের ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচিত হল। ফলে নানান বাজেটের বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম দিল্লি বোর্ডের স্কুল গোটা দেশের মত এরাজ্যেও ছড়িয়ে গেল। সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষায় সফল হতে গেলে, অর্থনীতির নতুন চালচিত্রে চাকরির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ইংরেজি ছাড়া গতি নেই; এই ভাবাদর্শ ম্যাজিকের মত কাজ করল। একটু ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে যে এই ব্যাঙের ছাতার মত ইংরেজি মাধ্যম স্কুল গজিয়ে উঠল প্রধানত কলকাতা, দুর্গাপুর, আসানসোল, শিলিগুড়ি ও হলদিয়ার মত অর্থনৈতিক ভাবে এগিয়ে থাকা শহরে যা এখন সমস্ত শহর ও আধাশহরে ছড়িয়ে পড়েছে।

বিষয়টা দেখেও কিন্তু বাংলা মাধ্যমের স্কুলগুলি পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিজেদের বদলাতে পারেনি। সরকারি স্কুলে শিক্ষকদের চাকরির নিশ্চয়তা, বেতন বেসরকারি স্কুল থেকে অনেক উন্নত হওয়া সত্ত্বেও মূল সমস্যার কোনও সমাধান হয়নি। শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের কাজের মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে কোনও চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স না থাকায়, স্কুলগুলো থেকে সরকারি পরিদর্শন উঠে যাওয়ার কারণে পরিস্থিতি ক্রমেই খারাপের দিকে গেছে এবং এর দায় শিক্ষা দপ্তরের নীতি প্রণেতাদেরই নিতে হবে। অনেকে আজ স্কুল শিক্ষকদের স্বল্পতার কথা বলছেন কিন্তু বাস্তব হল বামফ্রন্টের সময় নিয়ম করে স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ হত। সেই সময় থেকেই কিন্তু ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোর রমরমা শুরু। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হল শিক্ষার অধিকার আইন লাগু হবার পর। প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থার ভীতি থেকে শিক্ষার্থীকে মুক্ত করার জন্য প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়া শিক্ষা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে যৌক্তিক কিন্তু তার বদলে যে নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ণ চালু হল তা কার্যকরী করার ক্ষেত্রে কোনও

পরিকল্পনা শিক্ষা দপ্তরের ছিল না। কিছু না শিখেই পরের শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হওয়ার ফল হল মারাত্মক। যারা মফস্বল ও গ্রামের স্কুলগুলোতে শিক্ষকতা করেন তারা জানেন ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থী নিজের নাম লিখতে বা দুয়ের ঘরের নামতা লিখতে পারছে না অথবা অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী দুই অঙ্কের যোগ করতে পারছে না; এক স্বাভাবিক ঘটনা।

পরিবর্তনের জমানায় স্কুল শিক্ষার উপরিকাঠামোতে কিছু সদর্থক উন্নতি হলেও পড়াশোনাটা ভয়ঙ্কর ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল। এর প্রথম কারণ অবশ্যই স্কুল সার্ভিস কমিশনের মতো যোগ্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষয়, প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের অচলাবস্থা ও শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে পর্বত প্রমাণ ব্যর্থতা। দুর্নীতির প্রকাশ আজ এতটাই গভীর যে রাজ্যের শিক্ষকদের যোগ্যতা আজ প্রশ্নচিহ্নের সম্মুখীন। একে তো শিক্ষকের অভাব অন্যদিকে অবৈজ্ঞানিক বদলি নীতি। স্কুলের শিক্ষকদের বদলির দাবি দীর্ঘদিনের এবং ন্যায্য। এই সরকার যখন মিউচুয়াল ট্রান্সফার ও সাধারণ বদলি চালু করেছিল তখন প্রায় সবাই তাকে স্বাগত জানিয়েছিল। কিন্তু সর্বনাশ হয়ে গেল উৎসশ্রী ও স্পেশাল গ্রাউন্ড ট্রান্সফারের নামে গণবদলি চালু করে। এমনকি কাঞ্চন মূল্যের বিনিময়ে শিক্ষকেরা পছন্দের স্কুল খুঁজে নিয়েছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে। এতে গ্রাম থেকে শহরে দলে দলে শিক্ষকরা বদলি হলেন অথচ নতুন নিয়োগ না হওয়ার কারণে গ্রামের স্কুলগুলো আজ ফাঁকা হয়ে গেছে। শিক্ষার গুণগত মান কমে যাওয়ার আরেকটা বড়ো কারণ পড়াশোনার বাইরে অন্য কাজে শিক্ষককে দায়িত্ব দেওয়া। নির্বাচন, ভোটার তালিকা সংশোধনের মতো কাজ আগে থেকেই ছিল, এখন যুক্ত হয়েছে নানান সরকারি প্রকল্পগুলোর হিসাব সামলানো। বহু স্কুলে ক্লার্ক যথেষ্ট সংখ্যায় না থাকার কারণে শিক্ষকরা ক্লাস ফেলে রেখে পোর্টাল সামলাতে বাধ্য হন। এই অবস্থার নিট ফল বাংলা মাধ্যম সরকারি স্কুলগুলো সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান অনাস্থা। যে কোনও ভাবে শিক্ষার্থী ভর্তি করতে স্কুলের পক্ষ থেকে শিক্ষক মহাশয়রা রিকশায় মাইক বেঁধে প্রচার করছেন ; এ দৃশ্য আজ বিরল নয়। পরিস্থিতি জটিল, তা শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত সব পক্ষের জরুরি হস্তক্ষেপ দাবি করছে।

ইলোরা গ্লাস হাউস ও রামকৃষ্ণ ট্রেডার্স

প্রোঃ জয়ন্ত মণ্ডল

কাচ, প্লাইউড, সানমাইকা, অ্যালুমিনিয়াম চ্যানেল কাঠের বিট, থার্মোকল ও হার্ডওয়ার এর বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

॥ সততা ও ব্যবহারই আমাদের একমাত্র মূলধন ॥

কলেজ রোড ● করিমপুর ● নদীয়া

মোবাইল ঃ ৯৭৩৩৮৫৮৫৭৫, ৮৩৭২৮৫১৮৫০

থাবা

রেহান কৌশিক

মনে করে দ্যাখো—ইদানীং কোনো প্রশ্ন করা যাচ্ছে আর?
শেষ কবে অসন্তোষ জানিয়েছ প্রকাশ্য-চিৎকারে?

আনাচে-কানাচে ঘোরে গেস্টাপো-এজেন্ট
অন্ধকার হয়ে আসে, হাওয়া হয়ে সরে যায় প্রতিবাদ খুলে।

অথচ, বলার ছিল। ছিল না কি বেঁচে থাকা বিষয়ক কথা
শহরে-নগরে-গ্রামে, মাঠে ও নদীতে?

এখন বাউল একা দু-কলি পুরোনো গায়।
চন্দন-রংয়ের সব পাখিও জেনেছে
নতুনের শিসে আজ নিষেধাজ্ঞা আছে!
যেন সব ভালো আছে! 'ভালো আছি, ভালো থেকো' শ্লোক হয়ে ওড়ে
রাজ্য থেকে দেশ থেকে, পৃথিবীর পথে ও প্রান্তরে!

তাহলে সম্মুখে আর যুদ্ধমাঠ নেই?
নেই কোনো প্রকৃত ভ্যানগার্ড?
হয়তো-বা সিদ্ধান্ত এই—এ-জীবন থাবার তলায়
বসবাস করে।

কবিতা ও কবিতা

সন্দীপ সাহু

মাঠে ঘাটে ক্ষেতে খামারে রক্ত ঘাম হলে,
কবিতার অঙ্কুরোদগম হয়। কবিতা মাটি পায়।
মা পায়। লালন পালন পায়। দৃঢ় কশেরুকায়
মাথা তোলে। কালো এভারেস্টে থাকা মাথাও নত হয়।

আকাশে মেঘবালার সঙ্গে রঙিন ফানুস উড়িয়ে
কবিতা জন্ম নেয়। পরীর হাত ধরে উড়ে চলে।
পরী-যাদু দণ্ডে ধরা দেওয়া বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ও
বীণাপাণি-ছন্দ আসন পেতে কবিতাকে বরণ করে।

চার দিকের মন্দির মসজিদ গির্জা সর্বত্র
ঘণ্টাধ্বনি বেজে ওঠে। মন্ত্র উচ্চারিত হয়।
কবিতা মাথা নত করে পা খোঁজে।
দেব-পা নয়। ঘাম-চোর-পা। কবিরত্ন ওই পায়েই থাকে!

ঘাম- জরায়ুতে জন্ম নেওয়া কবিতা
মিছিল তৈরি করে। মিছিলে হাঁটে।
নবারুণের জন্ম দেয়।

উলঙ্গ রাজা, এখন

অরূপ কুমার দে

সবাই দেখছে রাজা, যথারীতি, উলঙ্গ,
বিপ্লবী গায়ক, সত্যদ্রষ্টা কবিও দেখছে, রাজা
উলঙ্গ, তবুও
সবাই হাততালি দিচ্ছে।
সবাই দেখছে, ন্যায় নীতি, মানবতা নামক অতীব
প্রয়োজনীয় শব্দগুলো
নির্লজ্জতার গভীরতর কবরের কৃষ্ণ গহ্বরে চাপা
পড়ে গেছে, দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন করতে যাদের হাতে
ক্ষমতা দেওয়া আছে, সেই তারাই
আইন আর বিচারের ন্যায় দণ্ডকে তুড়ি মেরে
উড়িয়ে,
বিপরীত কর্তব্য পালনে ভয়ংকর হয়ে উঠেছে।
সবাই দেখছে, গণতন্ত্র আজ বন্দুকের গরম সিসার
গুলির আঘাত
আর বোমার আগুনে পুড়ে ছাই,
অপরাধীরা রাজনীতির আশ্রয়ে এসে বুক ফুলিয়ে
অপরাধ আর শোষণ করে যাচ্ছে,
রাজা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা না করে
অপরাধীদের বুকে টেনে নিয়ে চালাচ্ছে দুর্নীতি,
শোষণ
আর ভয় দেখিয়ে নিরীহ মানুষের কণ্ঠ দমন।

সবাই দেখছে রাজা উলঙ্গ, তবুও
সবাই—আগুন খোর বিপ্লবী গায়ক কিংবা
মুক্তির দশকের সত্যদ্রষ্টা কবিরাও চেঁচিয়ে বলছে,
শাবাশ! শাবাশ!!

মৃতপ্রায় জনতার, কারও মনে ভয় আরও বেড়েছে,
কেউ বা বিবেকবুদ্ধি আগে থেকেই বন্ধক দিয়ে
রেখেছে।
প্রায় সকলেই পরান্নভোজী, কৃপাপ্রার্থী, উমেদার,
প্রবঞ্চক, চাটুকার, চোর, অমানুষ।
সবাই দেখছে রাজা উলঙ্গ, তবুও
আজীবন সুবিধাবাদের কারণে,
কিংবা দুর্নীতির অফুরান টাকা আর ক্ষমতার মোহে,
অযোগ্যতা সত্বেও, পড়ে পাওয়া পদের লোভে
রাজার নামে জয়ধ্বনি দিয়েই চলেছে।

গল্পটা সবাই জানত, কবিতাটাও সবাই জানে,
তলস্তয়, নীরেন্দ্রনাথ, সবারটাই জানে।
গল্প বা কবিতার ভিতরে শুধুই প্রশস্তি বাক্য
উচ্চারক
কিছু শিল্পী, কবি, গায়ক, স্তাবক নেই,
বরাবরের মতো লোকসানে চলা
বাড়ির খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো
কিছু মানুষও আছে।

গল্প বা কবিতার উলঙ্গ রাজা আবারও নেমেছে
বাস্তবের প্রকাশ্য রাস্তায়।
আবারও যথারীতি হাততালি উঠছে মুহুর্মুহু,
গায়ক কবিরাও বিপ্লব ভুলে আজ স্তাবকের
ভূমিকায়,
একদিন তাঁরা বিপ্লব রচনা করেছিলেন
কণ্ঠ কলম বেচার জন্য নিশ্চয়ই,
তাই আজ তাঁরা অনায়াসে উলঙ্গ রাজার
প্রসাদলোভী।

এই দুর্দিনে প্রতীকী শিশু নয়,
আমি গুটিকয় মানুষকে দেখতে পাচ্ছি।
রাজপথে হেঁটে চলেছে যারা একগাদা প্রশ্নচিহ্ন
নিয়ে।
প্রশ্নে প্রশ্নে মুখর রাজপথ।
শান্ত্রি সেপাইরাও মনে মনে কুর্নিশ না জানিয়ে
পারছে না।
এরই মাঝে আবার একদল ছদ্ম প্রতিবাদী
নেমে পড়েছে ঘোলা জলে মাছ ধরতে,
কোনও উলঙ্গ রাজারই নির্দেশে।
তবুও সত্যি মানুষগুলো ঝড় ঝঞ্ঝা পায়ে ঠেলে
সততা ও ন্যায়ের দাবির পথ ধরে এগিয়ে চলেছে
রাজপথ মুখরিত করে।

যাও যেমন করে পার, ওই মানুষগুলোর
পায়ে পা, হাতে হাত, কাঁধে কাঁধ মেলাও।
তারপর তোমাদের সবার বজ্রনির্ঘোষ আছড়ে
পড়ুক:
রাজা, এবার যে তোকে কাপড় পরতেই হবে।

শুনি আহ্বান

সৌমেন্দ্র মোহন পাঁজা

এখন একটি নতুন বছরের আদি লগ্ন। অন্যদিকে বঙ্গে একটি ব্যতিক্রমী ঐক্যের প্রথম 'রাজ্য সম্মেলন'। 'নন্দিনী' থেকে 'রক্তকরবী' হয়ে ওঠা পথের দীর্ঘ মনস্তাত্ত্বিক বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। কেননা মানসিক উদ্বোধন আলোর মতোই গতিশীল। 'শিক্ষক শিক্ষাকর্মী ও শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চ' থেকে 'শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চ' হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে ছিল রেজিস্ট্রি অফিসের প্রত্যক্ষ টানাপোড়েন আর আমাদের ছিল নিবন্ধীকরণের দুর্বার আবেদন। যতবার নেপথ্যে হাত নাড়া দিয়েছে ততবারই নানা আঘাতে পথ হয়েছে আরও প্রশস্ত ও প্রত্যয়ী। অবশেষে মিলেছে স্বীকৃতি। কিন্তু প্রকৃত স্বীকৃতি হয়েছে অনেক আগেই। ২০১৮ সালে প্রিজাইডিং অফিসার শিক্ষক রাজকুমার রায়ের মর্মান্তিক রহস্য মৃত্যুর পর উত্তাল হয়ে উঠেছিল পাহাড় থেকে মোহনা পর্যন্ত। বর্তমান রাজ্য সম্পাদক মাননীয় কিংকর অধিকারীর সুযোগ্য নেতৃত্বে সেদিন আপামর শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গরা দিয়েছিলেন অকুণ্ঠ স্বীকৃতি। অদ্যাবধি সেই অন্তর্লীন প্রবাহে ও অপ্রতিরোধ্য আন্দোলনের ধারায় সংগঠন ক্রম ব্যাপ্তি লাভ করছে।

সকলে কি একই রকম কথা বলেন? নিশ্চয়ই না। বরং আজকের AI-এর যুগে প্রাণশক্তি হারিয়ে ধীরে ধীরে যান্ত্রিকতায় নিজের অজান্তে অনেকে নিমজ্জিত হচ্ছেন। কেউ কেউ সোশ্যাল মিডিয়ায় তীব্র প্রতিবাদে অবতীর্ণ হন,অথচ বাস্তবের প্রকাশ্য রাস্তায় তাঁরা আবার মুখ লুকিয়ে ফেলেন। এরই সুবাদে ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের সেল্‌ফি জোন করার ফরমান আসে। রাজনৈতিক সংকীর্ণতায় 'শিক্ষা' এখন সর্বাধিক উপেক্ষিত। কৈশোরের আমাদের বিদ্যালয়গুলি আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পড়াশোনার মান তলানিতে ঠেকেছে। শিক্ষা বিভাগের কর্তাব্যক্তিরা 'শিক্ষা' আর স্বচক্ষে দেখেন না, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সি লেন্স দিয়ে প্রত্যক্ষ করেন। পার্বিক মূল্যায়নের ছাত্র-ছাত্রীদের নম্বর আপলোড মধ্যরাতে সম্ভব হয়। বর্তমানে সরকারি প্রকল্প বিতরণের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে বিদ্যালয়। এই প্রসঙ্গে শিক্ষাবিদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা প্রণিধানযোগ্য-'এমন অবস্থায় মানুষ যখন একদিকে হেলিয়া পড়িতেছে তখন আর একদিকে প্রবল টান দেওয়াই তাহার পক্ষে সৎ শিক্ষা।'

কায়েমি ক্ষমতা কবে সত্যকে সহজে স্বীকার করেছে? আমাদের দেশে বেশ কিছু রাজ্যে নির্বাচন প্রক্রিয়া নীরবে সাঙ্গ হয়ে যায়। সাধারণ মানুষ তাঁর নিজের অধিকার বিনা বাধায় প্রয়োগ করতে পারেন। লুণ্ঠন হয় না একান্ত ব্যক্তিগত অধিকার। অথচ এখানে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রতিবারই রণক্ষেত্রে পরিণত হয় নির্বাচনের নামে ঘটে চলে প্রহসন। স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর পরও কেউ তার গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করতে পারবেন না? কেন্দ্রীয় বাহিনীর ঘেরাটোপে রক্ষিত হবে মানুষের মৌলিক অধিকার? লজ্জার সীমা নেই। অথচ একদিন এই বঙ্গই গোটা দেশকে পথ দেখিয়েছিল। মানবিকতা ও মূল্যবোধ ক্ষয়ের অন্ত্য সীমায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি। ভোটকর্মীদের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার দায়িত্ব দিয়ে বুথে পাঠানো হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তাঁদের চূড়ান্ত হেনস্থা হতে হয়। আবার কেউ কেউ প্রাণকে কোনোক্রমে রক্ষা করার তাগিদ নিয়ে কম্প্রোমাইজ করে বাড়ি ফিরতে বাধ্য হন। ভোটকর্মীরা বুথে যাওয়ার আগেও জানেন না, আদৌ তারা বাড়ি ফিরতে পারবেন কিনা! জেনে রাখা দরকার, যাঁরা ভোটকর্মীর দায়িত্ব পালন করেন তাঁদের মান-মর্যাদা আছে। রাজনৈতিক পালা বদল নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা নেই, আমাদের নিশ্চিত নিরাপত্তা নিয়ে আমরা অধিক চিন্তিত। যতদিন আমরা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় দায়িত্ব পালন করব চোখে ভাসবে প্রয়াত শিক্ষক রাজকুমার রায়ের রক্তাক্ত স্মৃতি। প্রয়াত শিক্ষক রেবতী মোহন বিশ্বাসের অকাল মৃত্যুর দুঃসহ অবহেলার অতীত। এই চূড়ান্ত দুর্ভোগের কোনো সমাধান কি নেই? এই লোক দেখানো নির্বাচনের কী মূল্য? গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বলি হয়ে গেছে প্রায় পঞ্চাশ জন মানুষের তাজা প্রাণ। বঙ্গের প্রাণের কি কোন দাম নেই? এত রক্তের বিনিময়ে যদি নির্বাচন হয় তবে সেই নির্বাচন প্রক্রিয়া অবিলম্বে বন্ধ হওয়া প্রয়োজন।

অন্যদিকে আমরা দাঁড়িয়ে আছি চরম সর্বনাশের প্রান্ত সীমায়। মনে রাখা দরকার, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমাজ সংস্কারক ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া এবং ডিরোজিওর ইয়ং বেঙ্গল দল গঠিত হওয়া অনিবার্য ছিল যুগের দাবি মেটাতেই। হাজার হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছাত্রাভাবে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ না হওয়ায় ও উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাবে ধুঁকছে। এই মুহূর্তে শিক্ষক ও সরকারি কর্মচারিরা সবচেয়ে বেশি বঞ্চনার শিকার। হাজার হাজার অযোগ্য ব্যক্তি বাঁকা পথে-শিক্ষক হয়ে উঠেছে। মূলেই রোপিত হয়ে গেছে সর্বনাশের বীজ। ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠক্রমে বাড়ছে অনাগ্রহ। বাড়ছে স্কুল ছুট প্রবণতা। সস্তায় শ্রমিক নির্মাণের উদ্দেশ্যে তরুণ প্রজন্ম নিতান্ত সামান্য অর্থের বিনিময়ে সরকারি অফিসে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে। দিনের পর দিন একটা অপরিকল্পিত ব্যবস্থা শিক্ষার উপর আক্রমণ নামিয়ে এনেছে। সবচেয়ে হেয় প্রতিপন্ন করা হচ্ছে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যকে।অথচ এই দুটি অত্যাবশ্যকীয় ব্যবস্থা জাতিসত্তা গঠন করে।আর কে উপাচার্য হবেন,কে অধ্যক্ষ হয়ে কায়েম করবেন রাজনৈতিক সংকীর্ণতা সেই দ্বৈরথে বেচারা শিক্ষা প্রাঙ্গণ নাজেহাল। এই সময়ে শুভ বোধবুদ্ধির দায়িত্ব অনেক বেশি। আমরা আত্মবীক্ষণের সামনে দাঁড়িয়ে এমন সংকটকালে শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথের কথাকে রাখতে পারি—"কারণ, শিশুদের পালন ও শিক্ষনের যথার্থ ভার পিতা মাতার উপর। কিন্তু পিতা-মাতার সে যোগ্যতা অথবা সুবিধা না থাকাতে অন্য উপযুক্ত লোকের সহায়তা আবশ্যক হইয়া ওঠে। এমন অবস্থায় গুরুকে পিতা-মাতা না হইলে চলে না। আমরা জীবনের শ্রেষ্ঠ জিনিসকে টাকা দিয়া কিনিয়া বা আংশিকভাবে গ্রহণ করিতে পারি না, তাহা স্নেহ-প্রেম-ভক্তির দ্বারাই আমরা আত্মসাৎ করিতে পারি।"

যখনই সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা বিপন্ন বিবর্ণ হতে বসেছে তখনই রন্ধ্রপথে এসেছে বাণিজ্যিকরণের দুরভিসন্ধি। বাজারজাত হচ্ছে মোটা টাকার বিনিময়ে টিউটোরিয়াল অ্যাপ। আর যাই হোক, শিক্ষা ক্রয়যোগ্য হতে পারে না। সরকারি ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত না করলে বেসরকারি ব্যবস্থা সফল করা যাবে কীভাবে! অথচ একটা সংবিধান স্বীকৃত রাষ্ট্রের দায়িত্ব ছিল নাগরিকের সাধারণ অধিকারগুলিকে সুনিশ্চিত করা। তা না করে সংবিধানের শপথ নিয়ে সুকৌশলে তারই চলছে অবহেলা। স্বাধীন রাষ্ট্র তার বিশেষ দায়িত্ব বিস্মৃত হতে বসলে তা স্মরণ করিয়ে দেওয়া সচেতন নাগরিকেরও একান্ত কর্তব্য।

যখন ব্যাংক কর্মীরা কিংবা রেলের কর্মচারীরা অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় দলমতের উর্ধ্বে উঠে ঐক্যবদ্ধ সফল আন্দোলন গড়ে তোলেন, তখন আমরা দূর থেকে খেদ প্রকাশ করি। আমরাও তো স্বপ্ন দেখি, শিক্ষক-কর্মচারি ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের যুক্তিনিষ্ঠ সত্য ও স্বাধীন মতামত প্রতিষ্ঠিত হবে একদিন,তার জন্য কোনো রাজনৈতিক দলের

কাছে নিজেদের বন্ধক রাখতে হবে না।এখন সারা পশ্চিমবঙ্গে 'শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চ' একটি পরিচিত অদলীয় সংগঠনের নাম। ভোটকর্মীদের সফল আন্দোলন পরিচালনার পাশাপাশি রাজপথের ধারে সহস্র দিন বসে থাকা যোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের নিয়ে আন্দোলন, শিক্ষা ক্ষেত্রকে রক্ষা ও নানা পেশাগত দাবিদাওয়া নিয়ে 'শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চ' প্রায় শতাধিক আন্দোলন সংঘটিত করেছে। সকলের মর্যাদা ও অধিকার রক্ষায় 'শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চ' অঙ্গীকারবদ্ধ। আজ যখন এমন এক সম্ভাবনা গড়ে উঠেছে, দল-মতের উর্ধ্বে উঠে একটি সংগঠন সকলের বঞ্চনা ও অধিকারের জন্য নিরলস প্রতিবাদ চালিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় আমরা কি নিস্পৃহ থাকতে পারি? আসুন, এই উপযুক্ত সময়। 'শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চ'-কে আরও শক্তিশালী রূপে গড়ে তুলি, নয়তো পরে অনুতাপ নিষ্ফল। শুভবোধ ও সংবেদনশীল বিবেকবান চেতনার এক মাহেন্দ্রক্ষণে এই সংগঠনের জন্মকথা অনেকেরই অজানা নয়। প্রসঙ্গক্রমে কবিগুরুর কথা স্মরণে আসে —'যেমন করিয়া হউক, সকল দিকেই আমরা মানুষকে চাই—তাহার পরিবর্তে প্রণালীর বটিকা গিলাইয়া কোনো কবিরাজ আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন না।'

শুধু রাজপথে নেমে প্রতিবাদ নয়,নানা সমস্যার সমাধানে সম্মানীয় আধিকারিকদের কাছে 'শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চ' রেখেছে সঠিক পথে সুচিন্তিত মীংমাসার সূত্র। কিন্তু আমরা তো জানি প্রবল ক্ষমতার আস্ফালন এইসব কথায় কর্ণপাত করে না। তাই আসুন, আমরা আরও ঐক্যবদ্ধ হই। বধিরের কর্ণগোচর হতে পারে এমন তীব্র সম্মিলিত স্বরে পৌঁছে দিই আগামীর শুভ বার্তা।

বর্তমান সময় দুর্যোগময়। দুঃখ-বেদনায় পীড়িত। কিন্তু ঝঞ্ঝাবিক্ষোভের মধ্যেও এক সৌন্দর্য স্বপ্নের ইন্দ্রধনু জগৎ আছে।তা শুধু বিভোর কল্পনায় নয়, সত্য কথন ও অদম্য প্রতিবাদের মধ্যেই নিহিত থাকে তার সম্ভাবনার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র। আমরাও 'শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চে'র মধ্যে সন্ধান পাচ্ছি তেমনি সূর্যোদয়ের সম্ভাবনা। পাশ্চাত্য কবি শেলী বিশ্বাস করতেন, জীর্ণ ব্যবস্থা ধ্বংসের মাধ্যমে পৃথিবীর নবজাগরণের সূত্রপাত ঘটবে। পবিত্রতা-শান্তি-আনন্দ-প্রেম ও স্বাধীনতার যৌগপত্যে গড়ে উঠবে এক স্বর্ণযুগের সম্ভাবনা—

'Tyrants and slaves are like shadows of night
In the van of morning light.'

ALLIANCE INDIA

A GROUP OF ENGINEERS
Civil Engineering Consultancy and Construction Management
BADAMTALA LANE, BARDHAMAN

হলমার্ক (916) 22K
H.U.I.D. কোডযুক্ত গহনা মানেই

রূপশ্রী জুয়েলার্স

ডেবরা বাজার।। পশ্চিম মেদিনীপুর
মোবাইল : ৯৪৩৪৬১০৫৪৯ / ৭৮৭২৩২২৪৫২

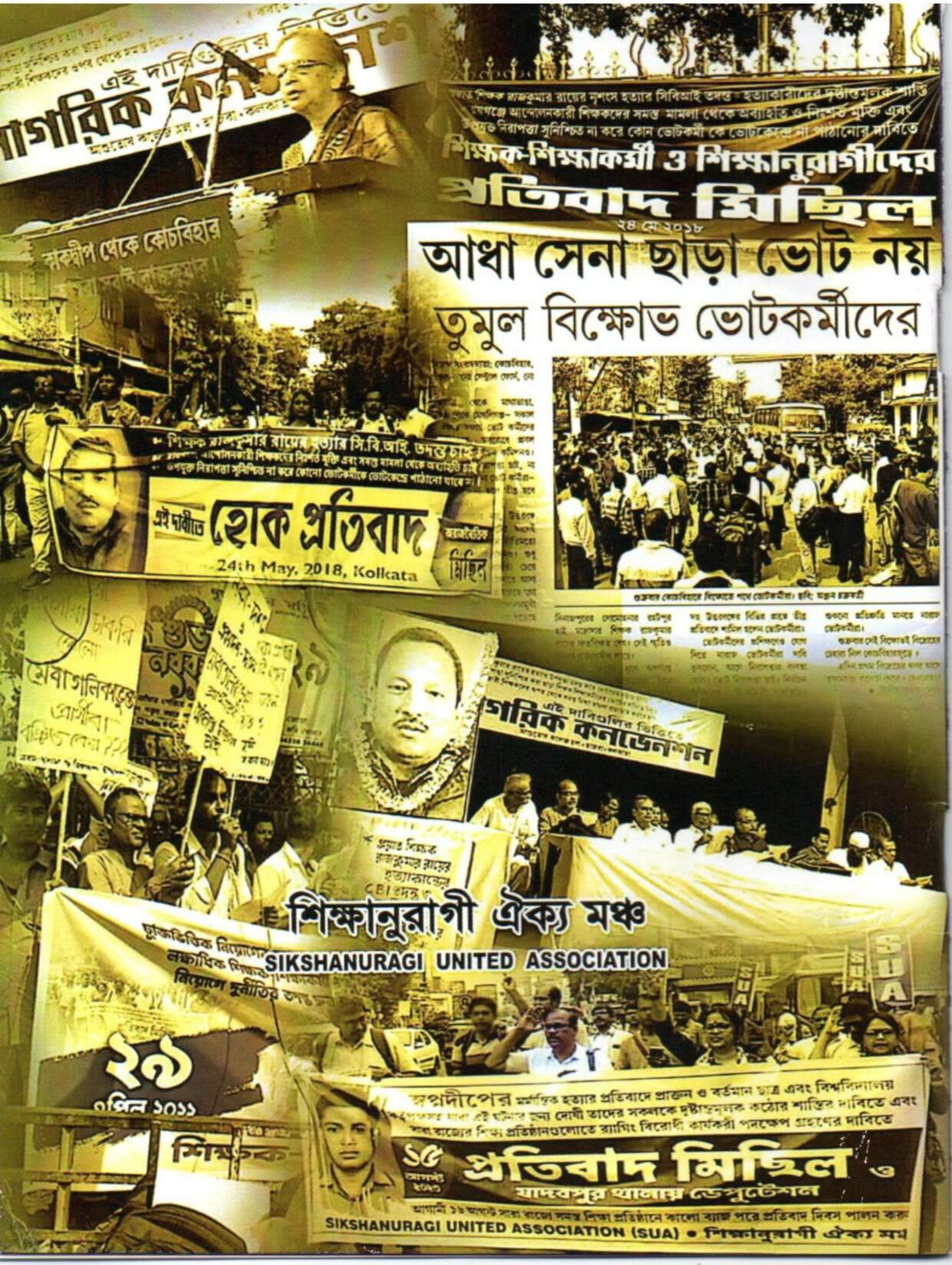

শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী ও শিক্ষানুরাগীদের
প্রতিবাদ মিছিল
২৪ মে ২০১৮
আধা সেনা ছাড়া ভোট নয়
তুমুল বিক্ষোভ ভোটকর্মীদের
কাকদ্বীপ থেকে কোচবিহার
এই দাবীতে হোক প্রতিবাদ
24th May, 2018, Kolkata
গরিক কনভেনশন
শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চ
SIKSHANURAGI UNITED ASSOCIATION
SUA
২৯
১৫ আগস্ট
প্রতিবাদ মিছিল ও
যাদবপুর থানায় ডেপুটেশন
SIKSHANURAGI UNITED ASSOCIATION (SUA) • শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চ